অগ্নিযাত্রার অগ্নিদূত

অগ্নিযাত্রার অগ্নিদূত

স্টুডেন্টওয়ে
বাংলাদেশে সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশনা জগতে
সেই ১৯৫০ সাল থেকে...

উৎসর্গ

“মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে”

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে। যারা নতুন করে আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখালো।

ভূমিকা

"সাবাশ বাংলাদেশ,
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।"

অগ্রযাত্রার পথে যারা অদম্য, শাণিত চোখে যাদের দ্বিধাহীন প্রতিশ্রুতি, যারা দুর্মর, যারা নির্ভীক, যারা স্বপ্ন দেখে, যারা স্বপ্ন দেখায়- এই বইটি সেই অগ্রদূতদের গল্প।

২০২৫ পাঠাও-এর জন্য একটি বিশেষ বছর। এই বছরই আমরা আমাদের অগ্রযাত্রার দশম বছরে পা রাখছি। আমাদের এই দীর্ঘ দশ বছরের পথচলায় আমরা কৃতজ্ঞ আপনাদের সবার প্রতি, যারা আমাদের ওপর আস্থা রেখেছেন। যাদের হাত ধরে পাঠাও আজ দেশের অন্যতম বড় টেক-ব্র্যান্ড।

পাঠাও-এর পথচলার একটা দারুণ ব্যাপার এই যে, এই প্ল্যাটফর্মটিকে কেন্দ্র করে আমাদের সবার জীবনেই দারুণ কিছু গল্প তৈরি হয়েছে, হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। যিনি রাইড নিচ্ছেন কিংবা দিচ্ছেন, প্রত্যেকেরই জীবনে কিছু মুহূর্ত, কিছু গল্প তৈরি করছে পাঠাও। গল্পেরা ডালপালা মেলছে কখনো ফুডম্যান আর রেস্টুরেন্টকে কেন্দ্র করে। কখনো একজন মার্চেন্ট এবং একজন ডেলিভারি এজেন্টকে কেন্দ্র করে। এতসব গল্পের ভিড়ে কিছু গল্প থাকে একটু ব্যতিক্রম। সেই গল্পগুলোয় আমরা দেখতে পাই একজন রাইডার কীভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলনে আহত এক তরুণকে নিয়ে ছুটে চলেছেন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। কিংবা কখনো দেখি একজন ক্যাপ্টেন সারাদিনের আয় দিয়ে পানি কিনে বিতরণ করছেন আন্দোলনরত ছাত্রজনতার মাঝে। আমরা দেখি পাঠাও-এর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ। কীভাবে এক দম্পতি অল্প কয়েকটি ওড়না নিয়ে শুরু করে

কয়েক বছরের ব্যবধানেই গড়ে তুলেছেন ৫০০০ স্কয়ার ফিটের বিশাল শোরুম। কীভাবে কেউ তার অফিসের সকল স্টাফকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন বন্যার্তদের রেসকিউ মিশনে।

আমরা গর্বিত বোধ করি, যখন দেখি আমাদেরই তৈরি করা কোনো ফিচার নিয়ে ইউজাররা কথা বলছেন, কীভাবে জীবনের কঠিন কোনো এক সময়ে এই ফিচারটি ত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের জন্য। পাঠাও-এর নেপথ্যে যারা কাজ করছেন, এই প্ল্যাটফর্ম তো তাদের জন্যেও! ভালো কিছু করার, নতুন কিছু করার। তাই কাজ করতে করতে আমাদের জীবনেও তৈরি হয় দারুণ সব গল্প। এই গল্প নিজে এগিয়ে যাবার, এই গল্প সবাইকে এগিয়ে নেবার।

এইসব গল্পগুলোকে মলাটবদ্ধ করে পাঠকের হাতে তুলে দিতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। দশ বছরের পথচলায় যেই পাঠাও ইউনিভার্স গড়ে উঠেছে, আমরা বিশ্বাস করি সেই ইউনিভার্সে সম্পর্কগুলো কেবল লেনদেনের না। বরং পাঠাও প্ল্যাটফর্মকে কেন্দ্র করে এই ইউনিভার্সে প্রতিনিয়ত তৈরি হয় অনেক গল্প, যা আমাদের উৎসাহ জোগায় প্রতিটি মুহূর্তে। প্রেরণা দেয় আমাদের অগ্রযাত্রায়।

সূচিপত্র

পাঠাও ও আমি
ফাহিম আহমেদ ০৭

স্বপ্ন ও বাস্তবতার যোগসূত্র পাঠাও
সিফাত আহমেদ আদনান ২১

মেরাজুলের গল্প
আরিফ সিফাত ২৭

স্বপ্ন হলো সত্যি
তয়া মার্ট ৩১

চাকরি ছেড়ে মুক্তির পথে
মোঃ সাগর ৩৫

ক্লাউড কিচেন থেকে স্বপ্নের শুরু
জুবায়ের ৩৮

কিছু ত্যাগ থেকে অনেক পাওয়া
যোয়াইরা বিনতে মনোয়ার ৪১

হাল ছেড়ো না বন্ধু
রাদিয়া আফরিন অনি ৪৪

সম্ভাবনার নতুন দুয়ার
মাহামুদুল ইসলাম বনিয়ামিন ৪৭

অচেনা শহরের চেনা মানুষগুলো
তারিকুল ইসলাম নেহাল ৪৯

আমাদের সেফটি ফিচার
মো: ওমর ফারুক ৫২

শূন্য থেকেই শুরু
ইমন ৫৫

আমার জীবনের বাতিঘর
ওয়াসিম ৫৭

ভাড়া এখন আপনার হাতে
জাভিদ মালেক ৬০

পাঠাও নিয়েই বেড়ে ওঠা
নাবিল হোসেন ৬৩

পাঠাও ফুড-এ ভাগ্য বদল
রবিউল আলম ৬৫

এক নারী রাইডারের গল্প
মাসুমা আক্তার ৬৮

আদনান দ্যা বাইকার
আদনান ৭১

বিন্দু থেকে সিন্ধু
তানিয়া ইসলাম তৃণা ৭৫

সংকল্প
মণিরুল ইসলাম ৭৮

আয়েশা'স কিচেন
আয়েশা ৮২

হোম কিচেন থেকে শুরু
মহিন কাজী ৮৫

রাইড থেকেই দারুণ কিছু
মনতাজ ৮৮

স্বপ্ন আমার বড় হবে
সাদ্দাম ৯১

পাশে দাঁড়ানোর স্বাধীনতা
ফখরুদ্দীন ৯৪

পাঠাও ও আমি

ফাহিম আহমেদ

যাত্রা শুরু

সবার যাত্রার একটা শুরু থাকে। আমার এবং পাঠাও-এর যাত্রার শুরুটা ছিল পৃথক। কিন্তু একটা সময় সেটি হয়ে ওঠে অভিন্ন ও অনিবার্য।

আমি বড় হয়েছি বাংলাদেশে। ১৭/১৮ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা যাই। তারপর অনেক বছর কাজ করি নিউইয়র্কের কিছু স্বনামধন্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে। নিউইয়র্কে এক কফিশপে বসে প্রায়ই ভাবতাম, একদিন আমি দেশে ফিরবো। এখানে প্রবাসী অনেকেই দেশে ফেরার তাগিদবোধ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। কিন্তু আমি ফিরতে চাইতাম, শুধু সে কারণে নয়। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি নিজের দেশে নিজের মতো করে কিছু একটা করব। এই অদম্য ইচ্ছাটা আমাকে ভীষণভাবে তাড়া করতো। অবশেষে এক রাত না যাওয়া ভোরে চড়ে বসি উড়োজাহাজে। বুকের ভেতর দেশে ফেরার উত্তেজনা ও কিছু স্বপ্ন।

কর্মজীবনের বাংলাদেশ অধ্যায়ের শুরু একটা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে। এখানে আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় বিনিয়োগ করতাম। পাঠাও-এর সাথে প্রথম পরিচয় এভাবে কিছু বন্ধুর মাধ্যমে। ততোদিনে পাঠাও তাদের যাত্রা মাত্র শুরু করেছে। পাঠাও-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সাথে প্রথম দেখায় আমার মনে হয়েছিল তারা যথেষ্ট তরুণ ও মেধাবী। আমার কাজের সুবাদে অনেক প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান ও স্টার্টআপের প্রতিষ্ঠাতা ও টিম মেম্বারদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ভিন্নতা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তারা অন্যের সমস্যা না, বরং নিজেদের এবং তাদের বন্ধুদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলো সমাধান করছে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে।

কোন ভাবনা থেকে পাঠাও-এর সাথে যুক্ত হলাম? এত মেধাবীদের ভিড়ে কীই বা অবদান রাখতে পারি আমি? হয়তো সেটা কোনোভাবেই দমে না যাওয়া, হার না মানা। অথবা, কোন সময়ে পেছাতে হয় এগোনোর জন্য সেটা জানা, বোঝা ও নির্ধারণ করা। তবে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হলো, যোগ্য এবং ভালো মানুষকে খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে সঠিক জায়গায় কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া। এই বিশ্বাস, এই লক্ষ্য নিয়েই পাঠাও-এর সাথে আমার যাত্রা শুরু।

পাঠাও-এর আগে আমি কখনো উদ্যোক্তা হইনি। আমার এই উদ্যোক্তা হওয়ার রাস্তাটা কিন্তু একেবারেই মসৃণ ছিল না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমাদের এই জায়গায় আসতে হয়েছে। এখন আমাদের আড়াই হাজার কর্মী বাংলাদেশে কাজ করছে। নেপালে দুই শতাধিক। দশ হাজারের বেশি ডেলিভারি এজেন্ট আছে পাঠাও কুরিয়ার ও পাঠাও ফুড-এর সাথে যুক্ত। ২ লাখ উদ্যোক্তা যাদের অর্ধেকই হচ্ছে নারী আমাদের পাঠাও কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবহার করে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করছে। তাদের পণ্য গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। বেশিরভাগই তরুণ, তাদের বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩৫। এর বাইরে ৩ লাখ মানুষ রাইডার ও ক্যাপ্টেন পাঠাও-এর মাধ্যমে দৈনিক আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। এছাড়া আমাদের গ্রাহক সংখ্যা নেহায়েৎ কম নয়, এক কোটি।

পথে এলো বাধা

কিন্তু আমাদের যাত্রা অনেকবারই থমকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ২০২০-এর কোভিডের সময়ের কথা যদি বলি, আমাদের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ। আমরা তখনো বৈদেশিক বিনিয়োগ নির্ভরশীল। তখনও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইনি। তখন বেশকিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

আমরা ঠিক করি, কাউকে ছাঁটাই করব না। আমরা সবাই পে কাট নেবো। যার বেতন যত বেশি সে তত বেশি পে কাট নেবে। আমরা যারা একেবারে টপ ম্যানেজমেন্টে তারা কোনো বেতন নেবো না। এটা কোম্পানির সবাইকে ইমেলের মাধ্যমে জানিয়েছি। এরপরে অনেক কোম্পানি আমাদের অনুসরণ করেছে এবং আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেয়াটা খুব সহজ ছিল না। আমাদের ভেন্ডরস/ সার্ভিস প্রভাইডার যারা আছে তাদের বললাম আমরা টাকা দিতে পারছি না। কী করব?

তারা আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পেরে আমাদের সুযোগ দিলো ঘুরে দাঁড়াবার জন্যে। এসময়ে আমরা একটা জিনিস খুব পরিস্কার বুঝেছি, যেকোন অবস্থায় সৎ, স্বচ্ছ এবং স্বনির্ভর হতে হবে। অটল মনোবল